



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1148 - 1155

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

মহাত্মা গান্ধী : ন্যায় বিচারের অন্যতম অগ্রদূত

মনিরুল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ

Email ID: manirul072@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Satyagraha,
Soulless,
Freedom,
Decentralization,
Internationalism.

Abstract

Mahatma Gandhi is known as the father of Nation and a unique leader all over the world. He loved all people irrespective of caste, creed, sex and religion and was a champion of humanity. He fought against all kinds of injustice through Satyagraha, Swaraj, Sarvodaya and Trusteeship which are based on Non-violence. In his words, Satyagraha is a unique technique of eternal love force and war without violence. A Satyagrahi, who believes in Ahimsa, always fights for true love of man by devoting himself to change the society. Gandhi considered individuals as a source of all power that they formed a village republic without any discrimination which is called real democracy. To him, justice is a movement for social welfare. His ideas and actions transferred Indian political history. These powerful weapons were used against injustice, oppression and colonial domination which made him a great practical philosopher. His philosophy is, in fact, a philosophy of action. Gandhi believed the state as a soulless machine and used coercive power to individuals. But he didn't believe in destroying the state. He strongly believed in Swaraj, classless society and stateless democracy in India. Beyond politics, Gandhi addressed issues such as social equality, untouchability, communal harmony, Decentralization of power, individual freedom. They made his movements relevant to all humanity. Through the Movements for freedom, civil rights, peace, social justice and internationalism, he became a global leader. Those ideals made Gandhi a Pioneer of mankind whose legacy continues to guide us towards peace, justice and human dignity.

Discussion

ভারতীয় রাজনীতির মহান, অভিনব ও ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ন্যায়ের প্রবক্তা এবং মহৎ দার্শনিক। তিনি অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকারের মুখপাত্র। মহিলা ও নিচু জাতির মুক্তির জন্য নিরলস পরিত্রাতা। পারিবারিক সূত্রে তিনি সত্য, সহিষ্ণু, মানবিক ও ন্যায়ের প্রতীক হয়ে ওঠেন। ইংল্যান্ডে থেকে ১৮৯১ সালে ব্যারিস্টার পাস করে আইনজীবী পেশা শুরু করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে 'আব্দুল্লাহ এবং

কোম্পানির' থেকে পারিবারিক বিবাদ মীমাংসার সূত্রে ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেন এবং দীর্ঘ কুড়ি বছর ব্যারিষ্টার হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেন। আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকা সরকারের মদতে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়দের উপর নানা রকম অত্যাচার ও শোষণ করতো। এমনকি তাঁকে ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকা সত্ত্বেও জোরপূর্বক তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া কৃষ্ণাঙ্গদের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের নিয়ে 'নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস' ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার মাধ্যমে অহিংস ও অভিনব সত্যগ্রহ নামক গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ ও ভোটাধিকার ফিরে পায়। তখন থেকেই, ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রাম শুরু করেন যা তার জীবনের পাথেয় হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর মতে, -

“Justice that love gives is a surrender. Justice that law gives in a punishment.” (Bhalla, p. 65)

গান্ধীজী ব্যক্তির আত্মিক ও নৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়কে গ্রহণ করেছেন। কারণ আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার দ্বারা সবকিছুকে গ্রহণ করতে হবে। অপরপক্ষে আইনানুগ কাঠামো যখন শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ন্যায়কে মান্যতা দেয়ার প্রক্রিয়া। গান্ধীজী সাধারণ মানুষকে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস মনে করতেন। সেটা তাঁর রাজনৈতিক ন্যায়ের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাবোধ। মানুষ আত্মবিশ্বাসী হবে এবং তারা বুঝবে যে মানুষ ক্ষমতাহীন নয়। সাধারণ মানুষকে এই ভাবেই কোন বৈষম্য ছাড়াই সমক্ষমতা প্রদান, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বিকেন্দ্রীকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। ফলে এই ভাবেই গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠবে। আর ইহার ভিত্তি হবে ন্যায় ভিত্তিক সমাজ। যা বলা যেতে পারে গান্ধীজীর রামরাজ্য। কল্পিত রামরাজ্যে সম্পর্কে গান্ধীজী ১৯৩৪ সালে লিখিত এক প্রবন্ধে বলেন, ‘রাজা ও ভিখারী উভয়ের অধিকার সুনিশ্চিত করবে’। এই ব্যবস্থাই গান্ধীজীর মতে, নিখুঁত বা প্রকৃত গণতন্ত্র। যেখানে বিভ্র, বর্ণ, জাত আর লিঙ্গভিত্তিক যাবতীয় বৈষম্যই দূরীভূত হয়ে যাবে। কারণ, রামরাজ্য দাঁড়িয়ে আছে নৈতিক অনুশাসনের ওপর। এবং এই ভাবেই শ্রেণীসম্বন্ধ ভিত্তিক গ্রামস্বরাজ প্রতিষ্ঠার কথা গান্ধীজীর রাষ্ট্র ভাবনার অভিনবত্ব এনেছেন। তাঁর মতে, -

“ভারত বাস করে তার গ্রামে, গ্রাম যদি ধ্বংস হয়ে যায়, ভারত ও ধ্বংস হয়ে যাবে, ভারত আর ভারত থাকবে না, জগতে তার যে ব্রত রয়েছে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।” (মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৬০)

গান্ধীজীর এই ভাবনা থেকেই অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে তাঁর বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা। এই ভাবে গান্ধীজী ভারতের বৈচিত্র্যকে লক্ষ্য করে বিকেন্দ্রীকরণের অনিবার্যতাকে গ্রহণের কথা বলেছেন।

তত্ত্বগতভাবে ন্যায়, ‘Justice’ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Justus এবং Justitia থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হল বন্ধন বা সুসামঞ্জস্য বিধান বা সমন্বয়সাধন। বার্কারের ভাষায় ন্যায় হল, বিভিন্ন রাজনৈতিক মূল্যবোধের বিন্যাসসাধন, সংযুক্তিকরণ অথবা সুসামঞ্জস্য বিধান। তথা এটা হল যাবতীয় মূল্যবোধের একটি বিন্যস্ত, অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ রূপ। এডু হেউড এর মতে, যার যা প্রাপ্য, তাকে তা মিটিয়ে দেওয়া। নয়া উদারবাদী মার্কিন দার্শনিক জন রলস ন্যায় বলতে ন্যায়্যতা বা অখণ্ডতা অথবা সমসুযোগ (Justice as Fairness) কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে মৌল চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় বস্তুর সমবন্টন হওয়া উচিত। জন রলস ‘A Theory of Justice’ গ্রন্থে ন্যায় বিচারের তিনটি মৌল নীতি উল্লেখ করেন। যথা সমস্বাধীনতা, সমসুযোগ এবং বৈষম্যের নীতি। অর্থাৎ বৈষম্যের নীতি তখনই প্রযোজ্য যারা সমাজের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং পিছিয়ে পড়া, তাদের মৌল বিকাশের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

গান্ধীজী রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের হাত থেকে ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র বা নৈরাজ্যবাদী নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে তিনি ভয়ের চোখে দেখতেন। তবে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই ধারণার জন্য কম ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সেই রাষ্ট্রই ভালো যে রাষ্ট্র কম শাসন করবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বিপজ্জনক। তিনি বলেন, -

“I look upon any increase in the power of the state with the greatest fear.” (Mahajan, p. 890)

তবে গান্ধীজীর রাষ্ট্র রাজনীতির আধুনিক ধারণা সে কথাই প্রমাণ করে। কারণ, রাজনীতি সমাজ নিরপেক্ষ নয়। আর রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় হল ক্ষমতা। ক্ষমতাহীন রাজনীতি বা রাষ্ট্র অসম্ভব। ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে বল বা শক্তি প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবীভাবে যুক্ত। এক্ষেত্রে আমরা রাজনীতির কতগুলি সংজ্ঞা মূল্যায়ন করতে পারি। যেমন, ডেভিড ইস্টন (David Easton) -র মতে, রাজনীতি হল, মূল্যের কর্তৃত্বমূলক বরাদ্দের বন্টন (Authoritative allocation of values)। আর ল্যাস ওয়েলের (Harold Lasswell) মতে, রাজনীতি হল প্রভাব ও প্রভাবশালীর মধ্যকার সম্পর্ক (The study of influential)। অ্যালান বলের মতে, দ্বন্দ্ব-বিরোধের মীমাংসা। নারীবাদী তাত্ত্বিক কাটে মিলেট (Kate Millett)-র মতে, রাজনীতি হল, ব্যক্তিগত পরিসর ও রাজনীতির অঙ্গ (Personal is Political)। মার্কসীয় প্রবক্তা ভি আই লেনিনের মতে, রাজনীতি হল শ্রেণী সমূহের মধ্যকার সম্পর্ক (Politics is the relationships among the classes)। অর্থাৎ দাস ও দাস মালিক এর সম্পর্ক। তিনি আবার নিজেই বলেছেন, রাজনীতি হল অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ (Politics is concentrated expansion of economics)। অর্থাৎ, অর্থনীতি নিরপেক্ষ রাজনীতির আলোচনা অসম্ভব। আর এই রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। ফলে উপরোক্ত ধারণা থেকে রাষ্ট্রকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা যায় না। ফলে গান্ধীর ক্ষমতা ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণার যথার্থতা ও প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে মনে হয়। এই যথার্থতা থেকেই তিনি নিজস্ব মতামত জ্ঞাপন করেন। তবে কোথাও গান্ধীজী রাষ্ট্রের ধ্বংসের কথা বলেননি। এই রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় ব্যক্তি ও সমাজের ওপর আঘাত নামিয়ে এনেছে যা ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু তাঁর ভাষায় ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে এবং ব্যক্তি স্বার্থকে কোন অবস্থাতেই ছোট করা যাবে না। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য, -

“The rule of majority does not mean it should suppress the opinion or even an individual if it is sound. An individual’s opinion should have greater weight than the opinion of many, if that opinion sound. That is my view of real democracy.” (Mahajan, p. 892)

এমন কি তিনি গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হিসেবে মানতে রাজি নন। কারণ, সামাজিক ন্যায়, মানবতা, সংখ্যালঘুর অধিকার প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র চলতে পারে না। তাঁর মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে বা গণতন্ত্রে আইনের অপপ্রয়োগ ঘটে এবং ষড়যন্ত্রে পরিণত হতে পারে। তাঁর ভাষায়, -

“The rule of majority has a narrow application, i. e., one should yield to the majority in matters of detail. But it is slavery to be amenable to the majority, no matter what its decisions are. Democracy is not a state in which people act like sheep.” (Mahajan, p. 892)

কিন্তু তিনি ভারতের জন্য প্রকৃত স্বরাজের কথা বলেন যা প্রকৃত গণতন্ত্র। তবে তা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নয়। প্রকৃত গণতন্ত্রের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে, কিন্তু সেই কর্তৃত্ব জনগণের উপর বলপূর্বক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে না। গান্ধী এক্ষেত্রে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের আনুভূমিক সামাজিক বিন্যাস ঘটিয়েছেন, ব্যক্তি থেকে কেন্দ্র সরকার পর্যন্ত। গান্ধীজী ‘Young India’ গ্রন্থে ১৯২৫ সালে বলেছেন, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কেউ কাউকে ক্ষমতাগত দিক থেকে হস্তক্ষেপ করবে না। এই বিন্যাসে ক্ষমতা কোনভাবেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হবে না। প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকবে যাতে করে কোন কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে পারে। অপব্যবহার হলে জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তিনি কর্তৃত্বের যে তাত্ত্বিক বিন্যাস ঘটিয়েছেন তা স্বৈরাচার, বল প্রয়োগ এবং আধিপত্যবাদকে প্রতিহত করবে ও ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব সামাজিক গঠন ন্যায়বিন্যাস ঘটবে। অনেক তাত্ত্বিক তাঁকে, যাই বলুক তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ। যেটা রাষ্ট্রহীন সমাজ, সর্বোদয়, প্রভৃতির মাধ্যমে শোষণ ও অবিচার মুক্ত এবং নিরপেক্ষ সমাজ যা তাঁর ভাষায়, -

“I acknowledge no other God, but the God of truth and rightness.” (সরকার, পৃ. ২৫১)

ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা, যার মাধ্যমে ন্যায় বিচারের তত্ত্ব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। গান্ধীজী সত্যিকার অর্থে একজন ভারতীয়, যিনি সামগ্রিক কল্যাণের মাধ্যমে ন্যায়ের ধারণাকে সমাজে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করে গেছেন। গান্ধীজীর চিন্তাধারার যে তাত্ত্বিক আলোচনা অর্থাৎ অহিংসা, সত্যগ্রহ, স্বরাজ, সর্বোদয়, অছিব্যবস্থা প্রভৃতি কিন্তু সামাজিক

কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়েছেন। তত্ত্বিকতার চাইতে তাঁর নিকট মানবকল্যাণ অত্যন্ত আবশ্যিক বলে মনে করতেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে গান্ধীর বক্তব্য তুলে ধরা হল। সত্যাগ্রহে একজন সত্যাগ্রহী জীবন উৎসর্গ করে দিবে সমাজের জন্য। অর্থাৎ গান্ধীর ভাষায়, -

“A friend or a brother. A satyagrahi only acts against the evil and not against the evil-doer, since the doer is only a diseased person and the aim of a satyagrahi is to cure the diseased psychology.” (সরকার, পৃ. ২২৬)

গান্ধীজী ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পূজারি। এই সত্য ও ন্যায়কে মানব সমাজে বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োগ করেন। গান্ধীজী তাঁর চিন্তায় ন্যায়কে অন্যতম অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ তাঁর আত্মজীবনীতে তা তিনি তুলে ধরেন। তাঁর বিচারে ‘ঈশ্বর হল সত্য’, ‘সত্যই হল ঈশ্বর’। এক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি প্রকৃত সত্যাগ্রহী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে তিনি হবেন ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। তা হলে সমাজ জীবনে ও তার প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। এই জন্য সত্যাগ্রহ এবং অহিংসাকে অভিনব কায়দায় প্রয়োগ করেন। শ্রী ধারণীর মতে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ‘হিংসাহীন যুদ্ধ (war without violence) হিসাবে সত্যাগ্রহ এবং অহিংসাকে প্রয়োগ করেছেন। গান্ধীর সত্য ও অহিংসার দর্শন তরবারির থেকে ক্ষমতাপূর্ণ এবং তাঁর মতাদর্শ শান্তির প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধাশীল। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী এবং অভিনব দর্শন তাঁকে শান্তির দূত বানিয়েছে। ধূতি পরিহিত অর্ধনগ্ন ফকির বল-প্রয়োগ, ক্ষমতা, লাঠি, এক টুকরো পাথর অথবা কারো পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই উপমহাদেশীয় ৪০০ মিলিয়ন অস্ত্রহীন পরাধীন মানুষের স্বাধীনতার স্তম্ভ নির্মাণ করেন। অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ এ দুটো পদ্ধতি একে অপরের পরিপূরক। অহিংসাকে তিনি সত্যাগ্রহের উপায় এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার রাস্তা হিসেবে গ্রহণ করেন। সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে শক্তিতে পরিণত করে যে শক্তি আত্মার পরিপূর্ণ ও নৈতিকতা রূপান্তর ঘটিয়ে এমন এক মানবে পরিণত করে তাতে সত্যাগ্রহীর আত্মিক বা মননশক্তি দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা হয়, যা তাকে অন্যায়া, শোষণ এই নেতিবাচক দৃষ্টির উর্ধ্বে নিয়ে যায়।

গান্ধীজীর সর্বোদয় ভাবনার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল অহিংসা। লিও টলস্টেয়ের অহিংসা নীতির দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। গান্ধীর মতে, হিংসা মানবজীবনে কোন কল্যাণ নিয়ে আসে না। গান্ধীজী সর্বদা ন্যায়ের জন্য অহিংস প্রতিরোধে বিশ্বাসী। অহিংসা সত্যের প্রতীক বা অংশ। অহিংসা ব্যক্তিকে শক্তি, সাহস ও চেতনা প্রদান করে এবং সমাজের অসংখ্য অন্যায়া-অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাঁর হত্যা পর্যন্ত জীবনব্যাপী কর্মজীবন অহিংসা ও সমাজের প্রতি ন্যায়ের কাঙ্ক্ষারী হিসাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। মহাত্মার আদর্শ ও নীতি অর্থাৎ অহিংসনীতির অসীম উদারতা মানবতাকে হিংসামুক্ত করতে পারবে। কারণ, তাঁর অহিংসা নীতির পথ ভালো বা মন্দ সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর। তিনি নিজের ভাষায় বলেছেন, -

“It is non-violence only when we love those that hate us. I know how difficult it is to follow this grand law of love. But are not all great and good things difficult to do? Love of the hater is the most difficult of all. But by the grace of God even this most difficult thing becomes easy to accomplish if we want to do it.” (Gouba, political theory, p. 77)

সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ‘All Men are equal’ এবং বিশেষ করে হরিজনদের ‘Man of God’ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। সমাজের জন্য এই ধরনের চিন্তা তাঁর বৃহত্তর অবদান। এমনকি নারী-পুরুষের বৈষম্যকে তিনি মেনে নেননি। নারীর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, কর্মমুখী জীবন, শিক্ষা প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন। তবে নারী পুরুষের সমতাকে সমান উচ্চতায় না দেখলে ও তাঁর মতে, -

“Men and Women are equal in status but are not identical. They are a peerless pair being complementary to each other ... therefore it follows as a necessary corollary ... that anything that will impair the status of either of them will involve equal ruin of both.” (চক্রবর্তী, p. ৪২৫)

মহাত্মা গান্ধীর সকল চিন্তা ও চেতনা মানব কল্যাণকে সামনে রেখে তাঁর তত্ত্ব সমাজে ন্যায়ের আলো সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছে। তাঁর অন্যান্য ধারণার মধ্যে সর্বোদয় অন্যতম। সকলের কল্যাণ, ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ নয়। জন রাক্ষিনের ‘Unto the Last’ গ্রন্থটি গান্ধীজীকে অনুপ্রাণিত করে। তার ফলে গ্রামীণ সংস্কার, গ্রাম স্বরাজ গঠন, গ্রামীণ শিল্পের প্রসার, গ্রামীণ স্বনির্ভর অর্থনীতি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, জাত-পাত বিলোপ, নারী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা প্রভৃতি চিন্তাধারার মাধ্যমে

সর্বোদয়কে সমাজের জন্য তুলে ধরেন যা ন্যায় সঙ্গত জীবন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করে। সকলের মঙ্গলে নিজের মঙ্গল, সকলের কাজের মূল্য সমান এবং সাধারণ মানুষের জীবনই আদর্শ জীবন। এইভাবে তিনি কর্মমুখী ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়েন যা সামাজিক ন্যায়কে প্রতিফলন। গান্ধীজী ব্যক্তিগত ফলের পরিবর্তে কর্ম এবং কর্মের সামগ্রিক কল্যাণে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে গান্ধীজী সনাতন উদারবাদী তাত্ত্বিক বেহামের, - “greatest good of the greatest number”-র তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। কারণ সামগ্রিক কল্যাণ বা সকলের কল্যাণের কথা বলা হয়নি তত্ত্বে। গান্ধীজী কিন্তু এই তত্ত্বের বিপরীত দিকে গিয়ে, ‘greatest good for all’ এই তত্ত্বে আস্থা রেখেছেন। তা আমরা সর্বোদয়, অছিব্যবস্থা ইত্যাদি সকল আলোচনাতেই তার নিদর্শন পায়। যাতে সমাজের সুখম উন্নয়ন সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার মধ্য দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ফলে শ্রেণিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীভূত ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠবে। ব্যক্তিগত মালিকানার বিসর্জন দিয়ে সকলের স্বার্থে ভূদান ও সম্পত্তি প্রদানের মাধ্যমে জমি, কলকারখানা, ব্যবসা ও অন্যান্য সম্পত্তি সকলের স্বার্থে সামগ্রিক মালিকানার আওতায় আসবে। তাঁর এই তত্ত্ব যা সামগ্রিক কল্যাণ ও ন্যায়ের পরিপূরক হবে। গান্ধী ধর্মনিরপেক্ষ জনকল্যাণকামী বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের যে চিত্র দিয়েছেন, তাতে ব্যক্তি সর্বত্র ক্ষমতা ও উন্নয়ন মডেলের একক। জনগণের নির্বাচিত সাধারণ সভা অর্থাৎ গ্রামসংসদ বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় নিয়োগে কোন অসুবিধা না থাকার কথা। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পর্যাপ্ত ভাবে প্রত্যেক স্তরের আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। মহাত্মা গান্ধী কর্মচারীদের জনগণের প্রকৃত সেবক রূপে তুলে ধরেন। তারা সততা, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে। জনকল্যাণের ক্ষেত্রে কর ব্যবস্থা থেকে গরিবদের অব্যাহতি দিয়েছেন। এবং আদায়কৃত কর জনকল্যাণমূলক সেবায় ব্যবহার করা হবে। এমনকি কৃষকের নিকট খাদ্য সরবরাহের জন্য কোন মধ্যসত্ত ভোগী থাকবে না। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়াবাদের সহযোগিতা পাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোন বৈষম্য ছাড়াই।

গান্ধীর সত্যগ্রহের পথ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতা, মানব সমাজের প্রতিবন্ধকতা, অশুদ্ধ অপোস, অন্যায়, অসত্য প্রভৃতি প্রতিরোধের জন্য আত্মিক ভালবাসার সংগ্রাম ও সত্য এবং ন্যায়ের পথে আহ্বান যা সামগ্রিকভাবে মানুষের ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। গান্ধীজী সত্যগ্রহের বিভিন্ন ধরনের গুরুত্ব উপস্থাপিত করেন। তার অন্যতম নিদর্শন ভারতের অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা। ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীজীর অন্যতম জীবন সংগ্রামের দর্শনকে প্রতিফলিত করে এবং তিনি সর্বদাই আদর্শ ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতেন। যেহেতু অসহযোগ আন্দোলনের পথ ছিল অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ। কিন্তু জনগণ ১৯২২ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরি আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারণ এবং খুনের ঘটনার পর তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এই আন্দোলন ছিল তাঁর আদর্শের জ্বলন্ত নিদর্শন।

২রা জুলাই ১৯৩১ সালে ‘Young India’ গ্রন্থে গান্ধীজী স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা শক্তি অস্তিম উদ্দেশ্য নয়। কারণ ইহার সাথে স্বৈরতান্ত্রিকতা এবং বল প্রয়োগের অভ্যাস রয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি যেহেতু বল প্রয়োগে বিশ্বাসী এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত চরিত্র মানব সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তার জন্য তিনি আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের ধারণা থেকে সরে আসেন এবং রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের (stateless democracy)-র মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে এক্ষেত্রে, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য সামাজিক ন্যায়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ‘Young India’ গ্রন্থে গান্ধীজী ৭ই মে ১৯৩১, মন্তব্য করেছেন ভারত একটা বহুত্ববাদী বৈচিত্রময় দেশ। এই বহুত্ববাদী বৈচিত্র এবং সহিষ্ণুতাকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সকল বৈচিত্রের সমন্বয় সুরক্ষিত হবে এবং প্রগতি ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজে।

১লা ডিসেম্বর, ১৯২৭ গান্ধীজী ‘Young India’ গ্রন্থে অছিব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণের ধারণা অবতারণা করেন যা মজবুত পদক্ষেপ, সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য। তাঁর বক্তব্য ছিল, অছিব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার ভোগ দখলের পরিবর্তে সম্পত্তি সামাজিক কল্যাণে সকলের স্বার্থে জিন্মাদারের নিকট সুরক্ষিত থাকবে। ফলে দরিদ্রতা ও অনাহারের অবসান ঘটবে ও সামাজিক ন্যায় এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। গান্ধীর মতে, এই সম্পত্তি ঈশ্বরের উপহার, মানবতার সেবার জন্য।

গান্ধীজী ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা ও আত্মনির্ভরতার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। শুধুমাত্র বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তিতে গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন জাতি ও ব্যক্তির সামগ্রিক মুক্তি। জাতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ও স্বাধীন হবে। জাতির সংস্কৃতি ও নৈতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, স্বাধীন জাতির যদি না নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা না হয় তাহলে জাতি ও ব্যক্তির পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং জাতি গঠনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারণ ইহা ব্যক্তিকে চিন্তার জগতে স্বাবলম্বী করে তোলে। সামগ্রিক আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীন হয়ে উঠবে। ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে ব্যক্তি স্বাবলম্বী হয়। তখন তার সঙ্গে আর্থিক ও সংস্কৃতিগত পারস্পারিক সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন উপযুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে ব্যক্তির নৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা, মানবতার অপর দিক যা জাতীয় ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে শেখায়। এমনকি তিনি বিশ্বাস করতেন, কোন সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতিক সঙ্গে সমন্বয় না ঘটলে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না। সংস্কৃতিগত সমন্বয় বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদের মত আচরণ করে এবং প্রগতিশীলতার পথে সম্প্রসারিত হয়। গান্ধীজীর এই ধারণা প্রমাণ করে তিনি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে গ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সচলতা, সমন্বয় এবং নিজস্ব সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণে বিশ্বাসী যা সংস্কৃতিগত ন্যায়কে প্রতিফলিত করে। তার জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির স্বনির্ভরতা ও স্বশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ, অছিব্যবস্থা, সর্বোদয়, স্বনির্ভর শিক্ষা, শোষণের অবসান, নারী ও দলিতের ক্ষমতায়ন প্রভৃতির প্রয়োগে সামাজিক ন্যায়ের সোপান তৈরি করবে। এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা স্থানীয় চাহিদা অনুসারে বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে এবং ইংরেজিকে দ্বিতীয় ঐচ্ছিক ভাষার তকমা দেওয়া হবে। বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম নিম্নস্তরের শিক্ষাকে স্থানীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজানো হবে। এক্ষেত্রে কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রেশমবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গ্রামীণ অর্থনীতি, গ্রামীণ পুনর্গঠন, সমবায় ব্যবস্থা থাকবে, যার উদ্দেশ্য আত্মনির্ভরতা, যা তাঁর গঠনমূলক চিন্তাভাবনা।

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনে নৈতিকতা ও কর্তব্যের উপর জোর দিয়েছেন। কারণ নৈতিক চেতনাবোধ এবং কর্তব্যবোধ মানুষের নীতি ও বিবেকবোধকে জাগ্রত এবং অহিংস আন্দোলনকে সফল করে। অন্যথায় তা ব্যর্থ হতে পারে। তিনি নিজে ২৫ শে মার্চ ১৯৩৯ সালে ‘Young India’ গ্রন্থে বলেছেন, যারা কর্তব্য পালন করবে, তারা স্বাভাবিকভাবে অধিকার অর্জন করবে এবং সেটাই হবে মৌলিক অধিকার। ফলে সমাজ স্বাভাবিকভাবে প্রগতিশীলতার পথে অগ্রবর্তী হবে এবং সামাজিক ন্যায়ের বাতাবরণ তৈরি হবে।

গান্ধীজী শুধুমাত্র আদর্শ জাতীয়তাবাদী নন, সঙ্গে তিনি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী। ফলে উগ্র জাতীয়তাবাদের আগ্রাসনকে তিনি কোনোভাবেই মেনে নেননি এবং তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। গান্ধীজী শান্তিপূর্ণ জাতীয়তাবাদের পথে বিশ্বাসী ছিলেন সকল জাতির জন্য। গান্ধীর ভাষায় তা হল, -

“It is impossible for one to internationalist without being a nationalist. It is not nationalism that is an evil; it is the narrowness, selfishness, exclusiveness which is the bane of modern nations which is an evil. Indian nationalism wants to organise itself or to find full self-expression for the benefit and service of humanity at large.” (Mahajan, p. 894)

গান্ধীজী আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে কোন জাতিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভাবতে পারেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক জাতি কোন না কোন ভাবে পরস্পরের পরিপূরক। তাঁর ভাষায়, -

“The better mind of the world desires today not absolutely independent states warning one against another but a federation of friendly interdependent states.” (Mahajan 895)

তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা জাতিগত সাম্য বা আন্তর্জাতিক সাম্যে বিশ্বাসী যা জাতিগত ন্যায় কে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি বলেছেন,-

“As every country is free to eat, to drink and to breathe, even so is every nation free to manage its own affairs, no matter how badly.” (Ray, p. 97)

তাঁর এই চিন্তা ভাবনা জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বা জাতিগত সাম্যের প্রতীক। তিনি একজন মহান মানবতাবাদী, জাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের অগ্রদূত ছিলেন তা তাঁর এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, -

“My Patriotism is both exclusive and inclusive. It is exclusive in the sense that in all humanity. I confine my attention to the land of my birth, inclusive in the sense that my service is not of a competitive or antagonistic nature.” (Ray, p.132)

এই বিশ্বাস থেকেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারত পর্যন্ত মানবতার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন। ফলে মানবতা যতদিন পৃথিবীতে বাঁচবে, গান্ধী ও ততদিন মানুষের মনে বেঁচে থাকবেন “Gandhi belonged to Mankind.”

গান্ধীজী প্রযুক্তি নির্ভর ভোগবাদী আধুনিক সভ্যতা মেনে নিতে পারেননি। কারণ তাঁর নিকট তা ছিল, অন্ধকার এবং অসুস্থ প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাওয়া। তিনি সর্বদা সহজ সরল জীবন যাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর শ্লোগান ছিল, “Back to the village”, অর্থাৎ তিনি গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। ইহা তাঁর চেতনার বাস্তব জগৎ যা গ্রামীণ ব্যবস্থাকে সম্মানিত করেছে। ফলে গ্রামীণ ব্যবস্থা নিজস্ব মহিমা ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছে। অনুরূপভাবে পুঁজিবাদী সভ্যতায় শ্রমিকের উপর মর্মান্তিক শোষণকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। গান্ধীজী পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ কোন ব্যবস্থাকেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। কারণ, তিনি মানবতাবাদী, সমতাবাদী এবং যেকোনো ধরনের শোষণ ও কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা, বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন এবং সমবন্টন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। বলা যেতে পারে এই তিনটি গান্ধীবাদী অর্থনীতির মৌলিক দিক। তবে তিনি যন্ত্র নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেন নি। গ্রামীণ প্রজাতান্ত্রিক অর্থনীতি, দরিদ্র দূরীকরণ ও মানবতার জন্য ব্যবহৃত হবে। ফলে শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে শ্রমিকের মুক্তির বুনিয়ে তিনি রচনা করেন। তাঁর নিকট, labour is superior to capital and it can give a kind of dignity to the labouring person. মহাত্মা গান্ধী কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহারের কোন স্থান দেননি। গান্ধীজীর মতামত ছিল, যন্ত্র মানুষের কাজে সহযোগিতা করতে পারে, শুধুমাত্র উন্নততর কায়িক পরিশ্রমকে সমৃদ্ধ করার জন্য। গ্রামীণ হস্তশিল্পকে বাড়তি গুরুত্বের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের সমতা ফিরবে এবং গ্রাম অসম উন্নয়নের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

অস্পৃশ্যতাকে সমাজের একটি ব্যাধি বলেছেন। এই ব্যাধি সামাজিক অধিকার ও সমাজ থেকে অস্পৃশ্যদের বিচ্ছিন্ন এবং মর্যাদাহীন করে তোলে। এই বঞ্চনা ও শোষণের মাত্রা বলা যেতে পারে সীমাহীন। ফলে তাদেরকে মানুষ বলে মনে করত না সমাজ। তাদেরকে নিচু চোখে দেখায় সমাজ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গান্ধীজী অস্পৃশ্যদের সামাজিক অবস্থানকে তুলে ধরার জন্য বলেছেন, সামাজিকভাবে তারা কুষ্ঠরোগীর মত, অর্থনৈতিকভাবে দাসদের থেকে ও তাদের অবস্থা খারাপ, ধর্মীয় দিক থেকে তাদের ঈশ্বর দর্শনের পথে বাধা, মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে অস্পৃশ্যরা জনগণের রাস্তা, জনগণের স্কুল, জনগণের হাসপাতাল ও অন্যত্র প্রবেশের ক্ষেত্রে নানা রকম নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ইহা থেকে মর্মান্তিকতার ব্যাপ্তি বোঝা যায়। এই জন্য ইহাকে তিনি নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী অস্পৃশ্যদের ‘হরিজন’ বলে সম্বোধন করেন। হরিজন কথার অর্থ ঈশ্বরের সন্তান। এমনকি ‘ইয়ং ইন্ডিয়া’ গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে ‘হরিজন’ রাখেন। তিনি ভারতে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। গান্ধীর ভাষায়, - “We find such barriers erected everywhere in the world” (পাল, পৃ. ৩০৯). মানুষের হৃদয়ের ও মনের পরিবর্তন করে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতাকে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। এই জন্য অস্পৃশ্যতাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে তুলে ধরেন। গান্ধীজী তার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ জরুরী ইট ও ইটখোল দিয়ে একটি মন্দির তৈরি করার থেকে; কারণ অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক ব্যাধি। গান্ধী দৃঢ় ও শক্তভাবে মানুষের ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন যা সমাধিকার রক্ষা করবে। ফলে একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন যা জ্বলন্ত প্রতিফলন ভারতীয় সংবিধান রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

Bibliography:

Bhalla, Shalu. Quotes of Gandhi. Ubs Publishers, 1995, p. 65

Gouba, O.P. *Indian Political Thought*. National Paperbacks, 2002

Mohanty, Simple, “Approaches to the Study of Indian Politics and Nature of the State in India: Liberal, Marxist and Gandhian”, *Indian Politics in Comparative Perspective*, edited by Pravin Kumar Jha, Pearson, 2012, pp. 18-21

-
- Gouba, O.P. *An Introduction to Political Theory*. Mayur Paperbacks, 2015
- Mahajan, V.D. *Political Theory*. S. Chand and Company Ltd. 2006
- Padhy, K S. *Indian Political Thought*. PHI Learning, 2014
- Roy, Himanshu. “Gandhi : Swaraj and Satyagraha”, *Indian Political Thought Themes and Thinkers*, Edited by Himanshu Roy &M.P. Singh, 2019, PP. 264-269
- Ray, Dr. Manik Chandra. *Social and Political Philosophy of Mahatma Gandhi*. Shilpanagari Prakasani, 2014
- Roy, Utpal. *Introduction to Political Science*. Calcutta Book House, 2009
- মুখোপাধ্যায়, অপূর্ব, “রাষ্ট্রভাবনা-মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদ”, *রাজনীতির তত্ত্বকথা*, সম্পাদিত দীপক কুমার দাস, প্রকাশন একুশে, ২০০৬. পৃ. ১৬০
- পাল, শতরূপা, “গান্ধীর দৃষ্টিতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ : একটি ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত” এবং মহুয়া, সম্পাদিত মদনমোহন বেরা, ২০২২, পৃ. ৩০৯
- চট্টোপাধ্যায়, তপন, “গান্ধী : রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন”, *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন*, সম্পাদিত রাধারমন চক্রবর্তী, ২০০৯, পৃ. ৪০৫-৪২৯
- সরকার, কল্যাণ কুমার, *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস (প্রথম খন্ড)*, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, ২০১১